নির্বাচনী আইনের সংস্কার: আমরা কোথায়?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৪ আগস্ট, ২০১৩)

"বাবু রাম সাপুড়ে,
কোথা যাস বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা.
দুটো সাপ রেখে যা!
যে সাপের চোখ নেই,
শিং নেই, নোখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না,
কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোশ ফাশ,
মারে না কো ঢুঁশঢাঁশ,
নেই কোনো উৎপাত,
খায় শুধু দুধভাত,
সেই সাপ জ্যান্ত,
গোটা দুই আন্তো!"
--সুকুমার রায়, বাবুরাম সাপুড়ে

গত কয়েক সপ্তাহের গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে আমরা জেনেছি যে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইন ও বিধিবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে বা করছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও) সংশোধনের লক্ষ্যে কমিশন কতগুলো প্রস্তাব বিল আকারে ২৫ জুলাই, ২০১৩ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যায় যে, গত ২৮ জুলাই কমিশন তাদের প্রস্তাবিত বিলে আরেকটি পরিবর্তন এনে ধারা-৯১ই বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে আরেকটি সংশোধনী মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে (*প্রথম আলো*, ২৯ জুলাই ২০১৩)। প্রসঙ্গত, এর আগেও কমিশন তিনবার আরপিও পরিবর্তনের প্রস্তাবিত খসড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল, যা মন্ত্রণালয় থেকে ফেরত আসে (*মানবজমিন*, ২৬ জুলাই ২০১৩)। নির্বাচনী আচরণবিধি এখনও কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

যথাযথ আইনি কাঠামো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। নির্বাচনী আইনের যথার্থতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্যও অপরিহার্য। তাই কমিশনের প্রস্তাবিত আরপিওর খসড়ায় কী আছে তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যেই আজকের এ আলোচনা।

প্রস্তাবিত খসড়ায় কমিশন আরপিওর ৪১টি ধারায় ছোট-বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো হলো:

(১) নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা প্রদান ও প্রার্থীতা প্রত্যাহারের ক্ষমতা দলকে দেওয়ার লক্ষ্যে 'প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'র সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনা হয়েছে (ধারা ২VI)

(২) নিবাচনী আইন (ধারা-৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩,৮৪, ৮৬,৮৬ক ও ৮৬খ) লঙ্ঘনের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাজা প্রাপ্তির দুই বছর অতিবাহিত হবার পর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন [ধারা-১২(১)(ঘ)]। বিদ্যমান আইনে সাজাভোগ করে মুক্তি প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

(৩) ঋণ খেলাপী প্রার্থীর জামিনদার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য হবেন [নতুন ধারা-১২(১ক)]।

(৪) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য হবেন [ধারা-১২(১)(ন)]।*

(৫) কোনো প্রার্থী জ্ঞাতসারে মনোনয়নপত্র বা হলফনামায় মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা মনোনয়নপত্রে তথ্য গোপন করলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য হবেন [নতুন ধারা-১২(১)(ণ)]।*

(৬) সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানে, যেখানে সরকারের ৫০ শতাংশের ওপর শেয়ার আছে বা ওই সব প্রতিষ্ঠানের (এমনকি খণ্ডকালীন) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা (বর্তমানের সার্বক্ষনিকের পরিবর্তে) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য হবেন [ধারা-১২(১) ব্যাখ্যা ১]। বিদ্যমান আইনে শুধুমাত্র সার্বক্ষনিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের বেলায় এ অযোগ্যতা প্রযোজ্য।

(৭) নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের ক্ষমতা দলের নির্ধারিত প্রতিনিধিকে প্রদান করা হয়েছে [ধারা-১২(৩)]।*

(৮) নিবন্ধিত দল কর্তৃক মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের যথার্থ প্রতিনিধি কর্তৃক আরপিওর সব শর্ত পূরণ করার ভিত্তিতে (বিদ্যমান আইনে তা নেই)সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে [ধারা-১২(৩)]।*

(৯) নিবন্ধিতদল কর্তৃক প্রাথমিকভাবে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হলে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময়ের মধ্যে (বিদ্যমান আইনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পূর্বে) চূড়ান্তভাবে একজন মনোনীত প্রার্থীর নাম দলের যথার্থ প্রতিনিধি কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে [ধারা-১২(৩)(খ)]।

(১০) কোনো প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করলে তার একটি বৈধ হলে বাকিগুলো বাতিল হয়ে যাবে [ধারা-১৪(৩অ)]।বিদ্যমান আইনে যেটি প্রথম প্রাপ্ত সেটি ব্যতীত অন্য মনোনয়নপত্রগুলো বাতিল হয়ে যায়। প্রত্যাহারের আগেই প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে।

(১১) দল কর্তৃক প্রাথমিকভাবে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হলে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে একজন মনোনীত প্রার্থীর নাম দলের যথার্থ প্রতিনিধি কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। এর ফলে প্রাথমিকভাবে মনোনীত অন্য সবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গণ্য হবে [ধারা-১৬(১)(২)]। বিদ্যমান আইনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।*

(১২) ব্যালট পেপারে চিহ্ন দিয়ে (by marking) এবং সিল মেরেতা ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে ভোটার তার ভোট প্রদান করবেন (ধারা-২৬)। বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকাতে হয়।*

(১৩) প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়সীমা ২৫ লাখে বৃদ্ধি করা হয়েছে [ধারা-৪৪খ(৩)]।বিদ্যমান আইনে এই সীমা ১৫ লাখ টাকা। কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং করার বিধান করা হয়েছে[ধারা-৪৪খ(৬)]।*

(১৪) নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর লক্ষ্যে দলীয় প্রধানের বিভিন্ন আসনে সফরের খরচ তার নিজের নির্বাচনী খরচে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না [ধারা-৪৪গগ]।*

(১৫) নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনের লিখিত অনুরোধে যে কোনো সরকারি বিভাগে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোন ব্যক্তিকে অবিলম্বে বদলি করতে হবে [ধারা-৪৪ঙ(২)]।*

(১৬) প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য গোপন বা আরপিওর যে কোনো বিধান অমান্য করার অভিযোগে নির্বাচনী বিরোধের দরখাস্ত করা যাবে [ধারা-৫১(১)(খ)]।*

(১৭) কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক ও বেআইনি কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৭৩ ও ৭৪)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন দুই বছর ও সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমানের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১৮) কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণ শুরু হবার ৪৮ ঘন্টা পূর্ব ও পরের সময়ে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালালে এবং বিশৃঙ্খল ও সহিংস কার্যক্রমে জড়িত হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৭৮)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন দুই বছর ও সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(১৯) কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী কেন্দ্রের চৌহদ্দীর ৪০০ গজের মধ্যে ভোট চাওয়ার বা ভোট প্রদানে বাধা দেওয়ার কারণে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৭৯)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন ছয় মাস ও সর্বোচ্চ তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২০) নির্বাচনের দিনে ভোট কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানে লাউড স্পিকার ইত্যাদি চালালে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবার বিধান (ধারা-৮০)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন ছয় মাস ও সর্বোচ্চ তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২১) কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোট প্রদান ও গ্রহণে বাধা দানসহ আনুসঙ্গিক অপরাধের কারণে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮১)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন তিন বছর ও সর্বোচ্চ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২২) রিটানিং অফিসার, সহকারি রিটানিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচনী অনিয়মে জড়িত হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮১)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন তিন বছর ও সর্বোচ্চ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২৩) ভোট প্রদানে বাধা দান এবং কোন ভোটার কাকে ভোট দেবেন বা দিয়েছেন সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। বিধান (ধারা-৮২)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২৪) রিটার্নিং অফিসার, সহকারি রিটানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের ভোট গণনার গোপনীয়তা ভঙ্গের অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮৩)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমানের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২৫) রিটানিং অফিসার, সহকারি রিটানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের কাউকে ভোট দানে প্ররোচিত, প্রভাবিত বা বাধা দানের অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮৪)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমানের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২৬) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী ফলাফল প্রভাবিত করার অপরাধে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা-৮৬)। বিদ্যমান আইনে অন্যূন এক বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের এবং অনির্ধারিত পরিমানের অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে।*

(২৭) কোনো ব্যক্তি ইচছাকৃতভাবে বা বিনা কারণে কমিশনের নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (নতুন ধারা- ৮৬ক)।

(২৮) কোনো প্রতিষ্ঠান কমিশনের চাহিদা অনুযায়ীকমিশনকে সহযোগিতা দিতে ব্যর্থ হলে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি অসহযোগিতার সংগত কারণ দেখাতে ব্যর্থ হলে তিনি সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (নতুন ধারা ৮৬খ)।

(২৯) নিবন্ধিত দলকে ব্যক্তির পক্ষ থেকে দশ লাখ টাকার এবং কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৫০ লাখ টাকার (বিদ্যমান আইনে ২৫ লাখ টাকার পরিবর্তে) অনুদান সীমা বৃদ্ধির এবং চেক দ্বারা প্রদত্ত অনুদান আয়কর মুক্ত হবে [ধারা-৯০চ(১)(ক)(অ)(আ)]। বিদ্যমান আইনে এই সীমারেখা যথাক্রমে পাঁচ লাখ ও ২৫ লাখ টাকা।*

(৩০) দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে কমিটি ও দফতর না থাকলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হবে [ধারা-৯০জ(১)(ক)(iii)]।*

(৩১) বেআইনি কার্যক্রমে লিপ্ত কিংবা গুরুতর অসদাচরনের কারণে কোনো প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলের কারণে একজন মাত্র অবশিষ্ট প্রার্থী থাকলে সেই প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে [ধারা-৯১ই (২)]। বিদ্যমান আইনে একজন অবশিষ্ট প্রার্থীর ক্ষেত্রে নতুন করে নির্বাচন করার বিধান রয়েছে। পরবর্তীতে কমিশন অবশ্য পুরো ধারাটিই বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়।*

*** চিহ্নিত পরিবর্তনগুলো গুরুত্বপূর্ণ।**

মোটা দাগে পরিবর্তন

উপরে উল্লেখিত মোট ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে মোটা দাগে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেগুলো হলো:

(১) **ব্যালট পেপারে 'মার্কিং' করে এবং সিল মেরে ভোট দান:** বিদ্যমান আইনে ব্যালট পেপারে সিল মেরে তা ব্যালট বাক্সে ঢুকাতে হয়। প্রস্তাবিত আইনে সিল মারার পাশাপাশি ভোটারকে ব্যালট পেপারে মার্কিং করে তা ব্যালট বাক্সে ঢুকাতে হবে। অনেকের আশঙ্কা যে, নিরক্ষর ভোটারদের জন্য এ পরিবর্তন অসুবিধার সৃষ্টি করবে। কারণ মানুষ শুধুমাত্র সিল মেরে ভোট দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। একই সঙ্গে এর ফলে ভোট গ্রহণের গতি ধীর হয়ে যেতে পারে। তাই এ পরিবর্তনের সুপারিশ পুনঃবিবেচনা করা আবশ্যক।

(২) **নির্বাচনে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি:** আরপিওর প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নির্বাচনী ব্যয় বর্তমানের ১৫ লাখ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। অবাস্তব বলে মনে হলেও, আমরা মনে করি যে, ব্যয়সীমা বরং কমানো উচিৎ। কারণ এটি এক দিকে সাধারণ মানুষের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক, আরেক দিকে এর মাধ্যমে নির্বাচনে বিরাজমান টাকার খেলার অবসান হবে না। আমরা মনে করি যে, টাকার খেলাই আজ আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সব চেয়ে বড় হুমকি। তাই নির্বাচনে টাকার প্রভাব বন্ধ করার জন্য আজ জাতি হিসেবে আমাদেরকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। কমিশন অবশ্য নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আশাকরি কমিশন নিবিড়ভাবে মনিটরিংয়ের কাজটি করবে। একই সঙ্গে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিপোর্ট, ফরেনসিং একাউন্টিং পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে, গভীরভাবে খতিয়ে দেখবে। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত ও কার্যকর করতে হলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

(৩) **দণ্ডের বিধানে পরিবর্তন:** আরপিওর প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নির্বাচনী বিধিবিধান ভঙ্গের জন্য শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পন্ন করা যাবে। কিন্তু নির্বাহী

ম্যাজিট্রেটের শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ার সীমিত এবং অতীতে দেখা গিয়েছে যে, তারা অপরাধীদেরকে সাধারণত সামান্য অর্থদণ্ড দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। তাই গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য অভিযুক্তরা লঘুদণ্ড ভোগ করে পার পেয়ে যেতে পারেন, যা অপরাধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে না। এছাড়াও বাংলাদেশের বর্তমান চরম দলীয়করণের সংস্কৃতিতে নির্বাহী ম্যাজিট্রেটদের নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ও সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত। ফলে অনেকক্ষেত্রে অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব হতে পারে।

(৪) **স্বতন্ত্র প্রার্থী সম্পর্কে পরিবর্তন:** বিদ্যমান আইনে কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চাইলে তাকে এক-শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সাবেক এমপিদের ক্ষেত্রে অবশ্য এ বিধান প্রযোজ্য নয় এবং তারা এ তালিকা দাখিল না করেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে পারবেন।

অনেকেরই মনে আছে যে, গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল-৩ উপনির্বাচনে জনাব আমানুর রহমান খান রানা এক-শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকাসহ তার মনোনয়নপত্র জমা দেন। একই সঙ্গে তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনয়নও চান। তিনি মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রাথী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে জিতেন। এ ধরনের 'বিদ্রোহী প্রার্থী'র সমস্যা দূর করার জন্য কমিশন প্রস্তাব করেছে যে, কোনো দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম রিটানিং অফিসারের কাছে জমা দেওয়া হলে, অন্যসব প্রার্থীর, যারা দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দলের প্রত্যয়নপত্রসহ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাদের মনোনয়নপত্র আপনা থেকেই প্রত্যাহার হয়েছে বলে গণ্য হবে। ফলে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন চেয়ে এবং বঞ্চিত হয়ে জনাব রানার মত কেউ আর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এমনকি সাবেক এমপিরাও না।

কাউকে এমনভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা হলে, তাদের গণতান্ত্রিক, এমনকি কারো কারো মতে তাদের মৌলিক (সংগঠন করার) অধিকার হরণ করা হবে। এছাড়াও এ ক্ষেত্রে আরেকটি আইনি জটিলতা রয়েছে। ভোট প্রদান একটি গোপনীয় বিষয়, যা নিশ্চিত করার জন্য আরপিওতে একাধিক বিধান রয়েছে। যেমন, ধারা-৮২ ও ৮৩ অনুযায়ী, ভোটের গোপনীয়তা ভঙ্গ করা একটি দণ্ডণীয় অপরাধ। তাই স্বতন্ত্র প্রার্থীকে তার সমর্থনকারীদের নাম প্রকাশে বাধ্য করা আরপিওর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে আমাদের ধারণা। উপরন্তু নাম প্রকাশের ফলে বড় দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকরা হুমকির শিকার হতে পারেন।

(৫) **দলের বিদ্রোহী প্রার্থী সম্পর্কিত বিধানে পরিবর্তন:** কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের এখতিয়ার দলকে প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্তব্যক্তির নাম রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানোর সময় মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পূর্বের পরিবর্তে মনোয়নপত্র প্রত্যাহারের দিনকে ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্তিম মুহূর্তে এসে দলের চূড়ান্ত মনোনয়নের সিদ্ধান্ত জানা যাবে এবং কেউ এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলেও কোনো লাভ হবে না। কারণ দল কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত ব্যক্তির নাম রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রেরণ করা হলে দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত এবং দলের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে দাখিল করা অন্য সব মনোনয়নপত্র এরই মধ্যে বাতিল হয়ে যাবে।

বিদ্রোহী প্রার্থী নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আরপিওর প্রস্তাবিত সংশোধনীর ফলে দলের কর্তা ব্যক্তিদের, বিশেষত আমাদের দুই বড় দলের প্রধানদের মনোনয়ন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হবে। যেহেতু বিদ্যমান আইনি বিধান অনুযায়ী [ধারা-৯০খ(১)(খ)(রা)] দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন দিতে হবে না এবং মনোনয়ন প্রার্থীর ন্যূনতম তিন বছর দলের সদস্য থাকার বাধ্যবাধকতা [ধারা-(১)(ঞ)] মানা হয় না, তাই আমাদের নেত্রীদ্বয় তাদের খেয়াল-খুশী মত যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনয়ন দিতে পারবেন। কারণ বাংলাদেশের বাস্তবতায়, দলীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড নিতান্ত রাবার স্টাম্পিং বডি হিসেবে কাজ করে।

প্রসঙ্গত, গত নির্বাচন কমিশনের অধীনে (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে) প্রণীত অধ্যাদেশে সংসদ নির্বাচনে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন নির্ধারণের জন্য এক ধরনের 'দলীয় প্রাইমারী'র ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার অধীনে দলের স্থানীয় কমিটির মতামতের ভিত্তিতে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু নবম সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটি অনুমোদন কালে এতে পরিবর্তন এনে প্যানেলটি বিবেচনায় নিয়ে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার বিধান করা হয়। ফলে দলীয় প্রধানরা দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষমতা আবার ফিরে পান এবং এ প্রক্রিয়ায় দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ক্ষমতাহীন হন।

এধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ব্যবহার করে দলীয় প্রধানরা দলের যে কোনো মনোনয়ন প্রত্যাশীকেই, যে মনোনয়ন প্রত্যাশী দলের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, বঞ্চিত করতে পারবেন। এর ফলে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দলীয় প্রধানদের প্রতি

প্রশ্নাতীত আনুগত্য মনোনয়নের প্রাপ্তির জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডে পরিণত হবে। এ ধরনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে দলে অবশ্য বিদ্রোহও ঘটতে পারে। এছাড়াও এর মাধ্যমে মনোনয়ন বাণিজ্যের আরও বিস্তার ঘটবে এবং রাজনীতি আর ব্যবসা একাকার হয়ে যাবে।

বিদ্রোহী প্রার্থী বন্ধ করার পেছনে নির্বাচন কমিশনের যুক্তি হলো যে, এর ফলে রাজনৈতিক দলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ দায়িত্ব কমিশনের নয়। কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এর দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, যাতে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হয় এবং এর দায়বদ্ধতা এদেশের ভোটারদের কাছে, রাজনৈতিক দলের কাছে নয়। এছাড়াও বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না থাকলে, নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা কমে যাবে এবং ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধিও ছোট হয়ে আসবে। আর কম প্রার্থী মানে কম যোগ্য প্রার্থী এবং নির্বাচনে কম যোগ্য প্রার্থী দাঁড়ালে, স্বাভাবিকভাবেই কম যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

(৬) **প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা:** গত ২৫ জুলাই মন্ত্রণালয় প্রেরিত সংশোধনীতে প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা সম্বলিত আরপিওর ধারা-৯১ই সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়।এর তিনদিন পর ২৮ জুলাই কোনো এক অজ্ঞাত কারনে, যদিও এ ব্যাপারে বাজারে অনেক গুজব রয়েছে , কমিশন পুরো ধারাটিই বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের জানামতে, কোনো মহল থেকেই এটি বাতিলের দাবি উঠেনি। তাই কমিশনের সিদ্ধান্তটি সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না।

প্রবল সমালোচনার মুখে গত ৩০ জুলাই কমিশন তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের যুক্তি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করে। কমিশনের প্রথম যুক্তিটি হলো যে, এটি 'আনফেয়ার' বা বৈষম্যমূলক। দুইজন প্রার্থীর মধ্যে চরম অসদাচরণের দায়ে একজনের প্রার্থীতা বাতিল হলে আবার তফসিল ঘোষণা করে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করলে,যে প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করা হয়নি, তাকে বিনা অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এধরনের বৈষম্য আরপিওতে আরও রয়েছে। যেমন, কোনো বৈধ প্রার্থী মৃত্যুবরণ করলে নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের বিধান ধারা-১৭তে রয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনী ব্যয়সীমা ১৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ করাও সাধারণ নাগরিকের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক।

নির্বাচন কমিশনের আরেকটি যুক্তি হলো যে, বিধানটি আরপিওর ধারা-১৯এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ধারা-১৯ অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর একজন মাত্র বৈধ প্রার্থী অবশিষ্ট থাকলে তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, আরপিওতে এধরনের আরও অসঙ্গতি রয়েছে। যেমন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে মনোয়নপত্রের সঙ্গে এক-শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা সংযুক্ত করতে হয়। কিন্তু ভোট প্রদান একটি গোপনীয় বিষয়। বস্তুত, আরপিওর ধারা-৮২ ও ৮৩ অনুযায়ী, ভোট প্রদানের গোপনীয়তা ভঙ্গ করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এছাড়াও, স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে বাধা-নিষেধ এবং দলের বিদ্রোহী প্রার্থী নিয়ন্ত্রণে কঠোরতা নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে।

কমিশনের অন্য একটি যুক্তি হলো যে, ধারা ৯১ই কোনোদিন প্রয়োগ হয়নি এবং প্রয়োগ করা যাবেও না।ধারাটি প্রয়োগ করা হয়নি বলে, এটি ভবিষ্যতে প্রয়োগ করা হবে না, এটি একটি খোঁড়া যুক্তি।এটি ব্যবহারের হুমকিই হল একটি 'ডেটারেন্ট' বা নিরোধক। এই ধারাটি আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করার পর ২০০৮ সাল থেকে আমাদের নির্বাচনগুলোতে সহিংসতা বলতে গেলে অনুপস্থিত। গত জাতীয় নির্বাচনে একজনও মারা যায়নি, সাম্প্রতিক পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে একজন ব্যক্তিরও প্রাণহানি ঘটেনি। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে আমরা শুনেছি।

কমিশনের আরেকটি যুক্তি হলো যে, অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি বিধানের কাজটি তারা বিচার বিভাগের ওপর ছেড়ে দিতে চায়। নির্বাচনী বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে আমাদের বিচারবিভাগের কার্যক্রম চরম হতাশাব্যঞ্জক। নিকট অতীতের কোনো নির্বাচনীবিরোধের মামলাই সংসদের মেয়াদ শেষের আগে নিস্পন্ন হয়নি। তাই ধারা ৯১ই বাতিল করলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী আইন ভঙ্গের প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে, যা কমিশনের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এছাড়াও বিচারবিভাগকেই যদি দায়িত্ব দিতে হয়, তাহলে কমিশনের প্রয়োজনীয়তাই বা কেন? উপরন্তু, মনে রাখা প্রয়োজন যে, নির্বাচন কমিশন একটি আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান।

অনেকেরই স্মরণ আছে যে, ৯১ই ধারাটি ২০০১ সালের তত্ত্বাবধাযক সরকারের আমলে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে আরপিওতে সংযোজিত হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলগুলো একাট্টা হয়ে এটি বাতিল করায়। এরপর ২০০৮ সালে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এটি

আবার আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই এ অর্জনকে কমিশন কেন বিসর্জন দিতে চাইছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এছাড়াও এটি বাতিলের ফলে কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবে বলে আমাদের আশঙ্কা। উল্লেখ্য, চার মাস আগে চূড়ান্ত করা উপজেলা নির্বাচনী বিধিমালায়ও তা রাখা হয়েছে।উপরন্তু ৯১ই ধারা বাতিলেরএ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিশন নিজেদের সম্পর্কে একটি অহেতুক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে সরকারেরও বদনাম হচ্ছে। আর কমিশন সম্পর্কে সৃষ্ট বিতর্কের দ্রুত অবসান না হলে আগামী নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে যাবে। তাই আমরা আশাকরি যে, কমিশন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে। একই সঙ্গে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোও এবিষয়ে সুবিধাবাদের পরিবর্তে নৈতিক অবস্থান নেবে।

আরপিওতে সম্ভাব্য নতুন সংযোজন

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আমরা আরপিওতে আরও নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করছি:

(১) আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(২) 'না' ভোটের বিধান পুন:প্রবর্তন করা এবং 'না' ভোট জয়ী হলে নতুন প্রার্থীর অংশগ্রহণে পুন:নির্বাচনের আয়োজন।

(৩) হলফনামায় অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান এবং তথ্য গোপনের জন্য বিজয়ী প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান।

(৪) হলফনামার ছকে পরিবর্তন আনা। যেমন বয়স, পেশার সুস্পষ্ট বিবরণ, আয়ের উৎসের বিস্তারিত তথ্য, নিজের ও নির্ভরশীলদের সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও মূল্য উল্লেখ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ও সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিস্তারিত তথ্য, প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচিতি (দলবদলের তথ্যসহ অতীতের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিবরণী) ইত্যাদি সংযোজন।এর ফলে প্রার্থীরা তাদের আয়ের উৎসের বিস্তারিত বর্ণনা, সম্পদের মূল্য এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তাদের মালিকানার তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হবেন যা ভোটারদের জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) নির্বাচনকালীন গুরুতর অসদাচরণের জন্য তদন্ত সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা প্রদান।

(৬) মনোনয়নপত্র ইলেকট্রনিক ফাইলিং-এর বিধান।

(৭) দলের নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি সর্বোচ্চ তিন জনের প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি।

(৮) আইনটি বাংলায় করা প্রয়োজন।

(৯) ব্যালট পেপারেমার্কা এবং প্রার্থীর ছবি ব্যবহার।

পরিশেষে, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য একটি যথাযথ আইনি কাঠামো প্রণয়ন আবশ্যক।একাজটি সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা সমীচীন। তাই আমরা আশা করবো যে, নির্বাচন কমিশন সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও, এধরনের একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তাদের প্রস্তাবিত আরপিও সংশোধনীগুলো আবার পুনঃবিবেচনা করবে। একই সঙ্গে কমিশন আইনগুলোর কঠোরভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ নেবে।

6